



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 108 - 116

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

নবনীতা দেবসেনের রূপকথার গল্পে নারীর ক্ষমতায়ন

রিম্পা মাইতি

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : maity.rimpa87@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Women,
Empowerment,
Intelligence,
Determined, Brave,
Tolerant, fairytale,
self-reliant.

Abstract

Nabanita Deb Sen was a perpetually cheerful, exquisitely beautiful person, melded by a combination of upright character, sharp wit and profound scholarship. Nabanita Deb Sen, the noted poet, novelist, short story writer, play write, humorist and travel writer is unquestionably one of those accomplished women authors of contemporary Bengal. Her refined humor, free-spirited, erudite writing and deep understanding of the post-colonial and psychological problems of middle-class Bengalis have accorded her with a special place in contemporary Bengali literature. In Bengal's conservative society, Nabanita Deb Sen scene through out her life with the identity of a free spirit. Living life on her own terms with an unconquerable nature, Nabanita, in the multifaceted expansion of her personality, sometimes even surpassed her mother, Radharani Devi. In a male dominated society, her strong pretest against the discriminatory life experiences of women found expression in various forms of feminism. In her fairy tales, it is revealed that women are in no way inferior to men in society; they are capable of achieving victory not by physical strength, but by intelligence. Through the guise of children's literature, Nabanita Deb Sen's fairy tales seem to depict a picture of human life. She was able to win the hearts of children by blending imagination and reality in the way that resonated with their minds. Under the pretext of telling stories, she presented many profound truths of life of them. She sought to show children new perspectives, moving beyond traditional ways of thinking. The protagonists of her fairy tales are female. They were not weak; they are intelligent. They are not foolish, but resilient and patient. They are not afraid to conquer fear and embark on formidable journey alone when facing challenging situations. The women in Nabanita Dev Sen's fairy tales celebrate life's triumphs. In her writing, children's minds discover a different realm of imagination within lost fairy tales.

Discussion

বাংলা সাহিত্যের দিকপাল ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখিকা ছিলেন নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯)। তাঁর সাহিত্যকর্মের ব্যাপ্তি বিশাল। সামাজিক, রাজনৈতিক, মনোবৈজ্ঞানিক নানা বিষয়ে তাঁর অবদান অসীম। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, সাহিত্য আলোচনা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, হাস্যকৌতুক রচনা এবং শিশু সাহিত্য নিয়ে তাঁর রচনার পরিধি বিশাল। ১৯৩৮ সালের ৭২নং হিন্দুস্থান পার্কের ‘ভালো-বাসা’তে জন্ম হয় ‘খুকু’র। বাবা ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব। মাতা ছিলেন সেই সময়ের নারী সাহিত্যিক রাধারাণী দেবী, তৎকালীন সময়ে ‘অপরাজিতা দেবী’ ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করতেন। এই দুই সাহিত্যিকের ছোট খুকুর নাম ঠিক করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নবনীতা নামে। আরও একটি নামকরণ হয়েছিল তাঁর। স্নেহের রাধারাণী দেবীর মেয়ের নাম শেষ শয্যায় শুয়েও দিয়েছিলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় – ‘অনুরাধা’। নামকণের তিন দিন পরেই প্রয়াত হন কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাই শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া নামটিই আনুষ্ঠানিক নাম হয়ে দাঁড়ায় নবনীতা দেবসেনের।

মা রাধারাণী দেবীর মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিয়ে হয় এলাহাবাদে কর্মরত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নামে এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। ঘটনাচক্রে, কয়েক মাসের মধ্যেই মৃত্যু হয় স্বামীর। এই সময়ে অভাবনীয় ঘটনা ঘটে রাধারাণীর জীবনে। স্বামীর মৃত্যুর পর শাশুড়ির উৎসাহেই লেখালেখি ও বিদ্যাচর্চা শুরু করেন রাধারাণী দেবী। ‘অপরাজিতা দেবী’ ছদ্মনামে তিনি কবিতা লিখতে থাকেন। অনেকেই মনে করতেন নারীর ছদ্মনামে কোন কোন পুরুষের লেখা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা বিশ্বাস করেন নি। এই সময়ে রবি ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয় রাধারাণী দেবীর। সাহিত্যচর্চার সূত্রে পরবর্তী সময়ে বিধবা হয়েও নরেন্দ্রদেবকে যখন বিয়ে করা মনস্থির করেন রাধারাণী দেবী। তখন অনুমতি নিতে গিয়েছিলেন স্বয়ং কবিগুরুর কাছেই।

১৯৩১ সালে এক বিধবা নারীর স্বইচ্ছায় দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন, এ ছিল তৎকালীন সময়ের এই অভাবনীয় ঘটনা। তাই বিয়ের পরেই কাগজে শিরোনাম প্রকাশিত হয় - “রাধারাণী – নরেন্দ্রদেব বিবাহঃ কন্যার আত্ম সম্প্রদান।” সেই বিয়েতে সম্পূর্ণ সাহায্য ছিল তার প্রথম স্বামীর মায়ের। পরবর্তী সময়ে ৭২ নং হিন্দুস্থান পার্কের জমিটি কিনে সেখানে একটি বাড়ি তৈরি করেন নরেন্দ্র দেব। বাড়ির নাম হয় ‘ভালো-বাসা’। সেখানেই ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন নবনীতা দেবসেন। মা-বাবার বাড়ি ‘ভালো-বাসা’তেই তিনি থেকেছেন আমৃত্যু।

বাবা-মা দু’জনেই কবি দম্পতি নামে বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিলেন তৎকালীন সময়ে। সেই সুবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রথম চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, জলধর সেন, হেমেন্দ্রকুমার রায় সহ সমসাময়িক সব সাহিত্যিকদের সঙ্গেই ছিল নিবিড় যোগাযোগ। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় এক সাহিত্যঘেরা পরিবেশের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছিলেন নবনীতা তথা আদরের ‘খুকু’।

গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল থেকে বিদ্যালয়ের পাট শেষ করে ভর্তি হন লেডি ব্রোবোর্ন কলেজে, তারপর সেখান থেকে যান প্রেসিডেন্সি কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের শিক্ষাগুরুর আশীর্বাদ নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দেন বিদেশে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন মাস্টার্সের পড়াশোনা শেষ করার আশায়। তারপর বুমিংটনের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যের উপর পি এইচ ডি করেন। পরবর্তী সময়ে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মাতা সেনের সঙ্গে বিয়ের পর যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ পরিচালনা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন বহিরাগত অধ্যাপক হিসাবে কলম্বিয়া, শিকাগো, হার্ভার্ড এবং কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেছেন। এছাড়াও কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া এবং টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের রাধাকৃষ্ণ মেমোরিয়াল লেকচার সিরিজে মহাকাব্যিক বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেওয়ার সুবাদে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন এবং পরিচিতিও লাভ করেন। তাছাড়া যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, মেক্সিকো এবং জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহতেও পরিদর্শক অধ্যাপক হিসাবে সম্মান পান। পরবর্তী সময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন ২০০২ সালে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত।

১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ‘প্রথম প্রত্যয়’ প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য বিশিষ্ট রচনার মধ্যে রয়েছে – ‘স্বাগতো দেবদূত’ (১৯৭১), ‘আমি অনুপম’ (১৯৭৭), ‘মঁশিয়ে হুলোর হলিডে’ (১৯৮০), ‘নবনীতা’ (১৯৯৬) প্রভৃতি আখ্যান, ভ্রমণকথা ‘করুণা

তোমার কোন পথ দিয়ে' (১৯৭৮), ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনী, উপন্যাস মিলে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৮০। 'জগৎ মোহনবাবুর জগৎ', 'খগেনবাবুর পৃথিবী', 'বুদ্ধিবেচার সওদাগর', 'ট্রাকবহনে মাকমোহনে', 'পলাশপুরের পিকনিক', 'গল্পগুজব', 'বসনমামার বাড়ি' – প্রভৃতি জনপ্রিয় বইয়ের স্রষ্টা তিনি। ১৯৯৬ সালে মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশ পাওয়া তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম 'নব-নীতা'; এই আত্মজীবনীমূলক রম্যরচনাটির জন্য ১৯৯৯ সালে তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান। তাছাড়া 'গৌরী দেবী মেমোরিয়াল পুরস্কার' (১৯৯২), 'ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার', 'হারমনি এওয়ার্ড', 'প্রসাদ পুরস্কার', 'ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শরৎ পুরস্কার' (১৯৯৪), ২০০০ সালে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হন। কমলকুমার জাতীয় পুরস্কার পান ২০০৪ সালে। ২০১৯ সালে শিশু সাহিত্যে অবদানের জন্য 'সাহিত্য অ্যাকাডেমি বাল' পুরস্কার পান। ২০১৯ সালে ৭ই নভেম্বর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৮১ বছর বয়সে কলকাতায় নিজ বাসভবনে তিনি প্রয়াত হন।

বাবা নরেন্দ্র দেব, মা রাধারাণী দেবীর ছত্রছায়ায় এক সাহিত্যিক পরিমন্ডলের মধ্যেই বড় হয়ে ওঠা নবনীতা দেবসেনের। ছেলে ভুলানো রূপকথা থেকে অচঞ্চল কবিতা, ভ্রমণ সাহিত্য থেকে প্রবন্ধ সর্ব ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। কলকাতার একটি পত্রিকার রোববারের ম্যাগাজিনে 'ভালোবাসার বারান্দা' নামে তাঁর ধারাবাহিক রচনা অতি জনপ্রিয় হওয়ায় পরবর্তী সময়ে বই হিসাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর ছোটগল্পে যেমন নারীর কঠিন ধনিত হতে শোনা যায় তেমনি তাঁর রূপকথার গল্পগুলিতেও নারী নিজেদের মহিমায় সমুজ্জ্বল। তার রচিত 'রূপকথা সমগ্র'র ভূমিকাংশে তিনি জানিয়েছেন –

“আমার রূপকথায় একটু নারীশক্তির প্রকাশ আছে। রাজা, রাজপুত্রেরা আর নায়ক নন, ভুল ভ্রান্তি ভরা সাধারণ মানুষ। রানিরা ও রাজকন্যারা দুর্বল নন, অসহায় নন, তাঁরাই সক্ষম। বিপন্ন হলে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তাঁরাই নায়ক। তাঁরা নিজেরা শত্রুজয় করেন, কিন্তু বাহুবলে নয় বুদ্ধিবলে। রাজ্য উদ্ধার করেন, সুবুদ্ধির বলে, নারী-পুরুষের সামাজিক অসাম্য ঘোচাতে, নারীর আত্মনির্ভরতার প্রতি সম্মান, সমান সুযোগ পাক। নতুন যুগের মূল্যবোধগুলি এই নতুন যুগের ভাবনায় গোড়া থেকেই বুনে দেওয়া দরকার। রূপকথার দ্বারা তা সহজেই সম্ভব।”

তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজের প্রতি সাহিত্যের একটি দায়িত্ববোধ থাকে। তিনি সর্বদাই চেয়েছেন শিশুদের ভাবনা হবে নির্ভীক ও সদর্থক। শিশু মনের মধ্যে বিশ্বাস, মমত্ব ও বুদ্ধির ভিত্তি নির্মাণের মাধ্যমেই আগামী প্রজন্ম বড় হয়ে ওঠার পক্ষে তিনি আশাবাদী। নবনীতা দেবসেনের 'রূপকথা সমগ্র' যেন তাঁর চিন্তার অনুরণন। আলোচ্য প্রবন্ধে নবনীতা দেবসেনের রূপকথার সাহিত্যে নারীদের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গটির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

'ইচ্ছামতী' গল্পে দেখা যায় এক রাজা ও রানির ছয় পুত্র সন্তানের পর ঈশ্বরের আশীর্বাদে রানিয়ার কাজিত কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে, যার নাম রাখা হয় ইচ্ছামতী। রানিয়ার ইচ্ছানুসারে ইচ্ছামতী চাঁদের আলোর মতন রূপ, দুধের ফেনার মতো নরম, তুলতুলে হয়। তার গাল দুটি খরগোশের নাকের মতো গোলাপি, চোখ দুটি কটা, চুলগুলি সোনালি, রেশমের মতন নরম ও চকচকে। কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় রাজকন্যার মুখে কোন আওয়াজ নেই। রাজবৈদ্য কোন সুরাহা করতে পারেন না। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছামতী আরও সুন্দরী হওয়ার পাশে গুণীও হতে থাকে। মায়ের সব কাজের অর্ধেক মেয়ে করে দেয়। কিন্তু কন্যার ভবিষ্যতের চিন্তায় রানিমা অসুস্থ হয়ে পড়েন। মন্দিরে শিবঠাকুর মা ও মেয়ের প্রদত্ত দুটি ফুলের মালার পরিবর্তে একটি সুন্দর বেল, আকন্দ, ধূতরো ও কুন্দফুল সহকারে মালাটি দেখে শিবঠাকুর নিজেই মালায় গলাটি পরে মালাকরকে আশীর্বাদ দেন তার সমস্ত সখ-আহ্লাদ যেন পূরণ হয়। ইচ্ছামতীর ইচ্ছানুসারে শিবঠাকুরের আশীর্বাদে রানিমা সুস্থ হয়ে যান। রানিমা দৈববাণীর মাধ্যমে জানতে পারেন শিবতীর্থ গলে তবেই ইচ্ছামতী কথা বলতে পারবে। দৈববাণী শোনার পর রানিমা ঝড়-জল-বজ্রবিদ্যুতের মধ্যে শিবতীর্থের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। নানা প্রতিবন্ধকতা উত্তীর্ণ করে রানিমা শিবতীর্থে একাকী পৌঁছে রানিয়ার হাতের একটি পারিজাত একশো আটটি পারিজাত হয়ে যায় এবং রানিয়ার চোখের জলে শিবতীর্থের পূজো সম্পন্ন হয়। কিন্তু রানিয়ার কোন খোঁজ না পেয়ে রাজাসহ রাজপুত্রেরা

বিপদে পড়লে রানিয়ার বুদ্ধিতে স্বামী ও সন্তানদের প্রাণ বাঁচিয়ে রাজ্যে ফিরে আসেন। এমনকি রানিয়ার পূজার ফলস্বরূপ ইছামতীর গলার স্বরও ফিরে আসে। রানিয়ার দৃঢ়তায় ও চেষ্টায় রাজবাড়িতে আনন্দের পরিবেশ ফিরে আসে।

‘রূপসা আর রূপকুমার’ গল্পে দেখা যায় রূপসা গ্রামের শিক্ষিত ও যুক্তিসম্পন্ন এক মেয়ে, নানারকম বইপত্র পড়ে তার ধারণা হয় ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই। তাই গ্রামের সীমান্তে যে মন্ত ইঁদারা ছিল সেখানে অল্পবয়সী মেয়েরা কেউ যেত না। কারণ সাধারণ জনমানুষের মধ্যে ধারণা ছিল ইঁদারার কাছে গেলে ভূত বেরিয়ে তাদের খেয়ে নেবে। তাই সাহসে ভর করে একদিন রূপসা সেই জনশূণ্য ইঁদারার কাছে উপস্থিত হয়ে দেখে ইঁদারার চারিপাশ একদম পরিস্কার এবং লতানে গোলাপ দেখতে পায়। রূপসা মনে মনে ভাবতে থাকে জনমানব শূন্য ইঁদারার চারিপাশ এত সুন্দর পরিস্কার থাকার রহস্যটা কি হতে পারে। গোলাপফুলের সৌন্দর্য ও রূপে মুগ্ধ হয়ে রূপসা একটি গোলাপ ফুল ছিঁড়তেই দেখে তার পাশেই সাদা ধবধবে এক সুন্দর ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। রূপসা ভয় পেয়ে পালাতে চাইলেও দৌড়াতে পারে না। ভয়ে অন্যমনস্ক ভাবে মাথা থেকে লাল গোলাপটি খুলে পুনরায় নাড়াচড়া করতেই রূপসার পাশে নীল রেশম ও রূপোলি জরির পোশাক, গলায় মুক্তার মালা পরিহিত এক অপরূপ রাজকুমারকে দেখতে পায়। রাজকুমারকে দেখে রূপসা ভয় পেলেও তা সে প্রকাশ করে না। কথোপকথনের সূত্রে রূপসা জানতে পারে রূপকুমার ইঁদারার মধ্যে বাস করে এবং সে এক পরি-রাজপুত্র। রূপসা ও রূপকুমারের মধ্যে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। স্কুল ফেরত রূপসা রূপকুমারের সঙ্গে দেখা করে এবং সেই অবসরে রূপকুমার জাদুবলে ব্যাগবন্দী রূপসার খাতায় হোমওয়ার্ক করে দেয়। রূপসা জানতে পারে, যে সমস্ত বাচ্চারা অবাধ্য হয় ও মায়ের কথা শোনে না, তাদের পরিচয় চুরি করে রাজপুত্র বানিয়ে পরীর দেশে বন্দী করে রাখে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপসা বড় হয়ে থাকে। বাড়ি থেকে রূপসার বিবাহ স্থির হলে রূপসা রূপকুমারের কথা জানালে তার কথায় বাড়ির কেউ বিশ্বাস করে না। শেষ পর্যন্ত রূপসা রূপকুমারকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করার পন্থা হিসাবে জানতে পারে ঝুলন পূর্ণিমার রাতে পরিদের সামনে থেকে যদি দোলনা থেকে রূপকুমারকে নামানো যায় তাহলে রূপকুমার পুনরায় মানুষের রূপ ফিরে পাবে। পরিচয় রূপসাকে ভয় দেখাতে রূপকুমারকে জাদুবলে নানা জীবজন্তুতে পরিণত করলেও হাত ছাড়া চলবে না। কারণ তাহলে রূপকুমার কোনদিন মুক্তি পাবে না। সব জেনে উপযুক্ত দিনে রূপসা নিজের শাড়ির উপর ঠাকুমার বড় গামছাটি জড়িয়ে উপস্থিত হয় ইঁদারার কাছে। পৌঁছে দেখে সেখানে অনেক পরি-রাজকুমারের পাশাপাশি রূপকুমারও একটি সুন্দর ফুলের দোলনায় উপবিষ্ট। সুযোগ বুঝে রূপসা রূপকুমারকে দোলনা থেকে নামিয়ে হাতে ভালো করে ধরে রাখে। মায়া বলে পরিচয় রূপকুমারকে গিরগিটি, বাঘ, গোরিলা, লোহার শিক, বিরাট মাকড়সা, শকুন পাখি বানিয়ে ভয় দেখালেও নির্ভীক রূপসা রূপকুমারের হাত ছাড়ে না। শেষ পর্যন্ত রূপকুমার এক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হলে রূপসা অঙ্গারটিকে ইঁদারায় ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়াবি পরিবেশে হারিয়ে যায় ও ইঁদারা থেকে বেরিয়ে আসে মানুষরূপী রূপকুমার। রূপসার আনা ঠাকুমার গামছা পরিধান করে সে। শেষ পর্যন্ত রূপসা নিজের জীবনে ভালোবাসার মানুষটিকে ফিরে পায়। প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে ভয়কে জয় করে রূপসা নিজের প্রিয় মানুষটিকে নিজের জীবনে ফিরিয়ে আনে।

‘কাটুর-কুটুর’, পদ্মমুখী আর কাঠুরে কত্তা’ গল্পে দেখা যায় এক কাঠুরে বনে কাঠ কাটতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কাঠুরের সংসারে ছিল এক স্ত্রী, মেয়ে পদ্মমুখী ও কাঠবেড়ালির ছানা কাটুর-কুটুর। স্বামীর খোঁজ না পেয়ে পরিবারের পাশাপাশি গ্রামের সবার মন খারাপ হতে থাকে। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য গ্রামের সবাই কাঠুরের স্ত্রীকে বড়ি দিতে, ধান ভানতে ডাকে এবং পারিশ্রমিক সুলভ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় খাবার দিতে। কাঠুরের ছোট্ট মেয়েও মাকে সাহায্য করে ও সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোয় পড়াশোনা করে। পদ্মমুখী সবসময়ের সঙ্গী হল ছোট্ট কাঠবেড়ালি কাটুরকুটুর। কাঠুরের স্ত্রী ও সন্তান কাঠুরের ফিরে আসার অপেক্ষা করতে থাকে। পদ্মমুখী বাগান করতে ভালোবাসে। পদ্মমুখী হাতের স্পর্শে বাড়ির বাগানটির সৌন্দর্য দিনে দিনে বাড়তে থাকে। একদিন এক ন্যাকশিয়ালিনীর বাচ্চা পদ্মমুখীদের বাগানে মাছ ধরার জালে ধরা পড়লে পদ্মমুখীর মায়ের সহায়তায় শেয়ালের বাচ্চাকে মুক্ত করলে ন্যাকশিয়ালিনীর পদ্মমুখীর মাকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে চলে যায়। একদিন কাঠুরেদের পাশের বাড়িতে এক কৃপন দম্পতির বাড়িতে ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা সেই সম্পদ চোরাই সম্পদ বনের মধ্যে এক বিরাট বটগাছের কাছে এনে বন্দী শুকসারীকে ডেকে গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে চলে

যায়। ডাকাতদের সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখা ছোট কাঠবেড়ালি কাটুরকুটুর বাড়ি ফিরে পদ্মমুখীকে জানালে সে কাটুরকুটুরকে সঙ্গে নিয়ে কিছু খাবার নিয়ে জঙ্গলে বটগাছের কাছে উপস্থিত হয়। শুকসারীকে মুক্ত করে পদ্মমুখী চোরাই ধন উদ্ধার করার সময় একটি গামছার পুঁটলি দেখে চিনতে পারে গামছাটি তার বাবার। শুকসারির কাছ থেকে পদ্মমুখী জানতে পারে, ধনেশ পাখির থেকে অনেক ধন লাভ করার ফলে ডাকাতদের কুনজরে সে তাদের কাছে বন্দী। পিতার অবস্থান জানতে পদ্মমুখী ও শুকসারি ফন্দী করে জানতে পারে পদ্মমুখীর পিতাকে ডাকাতেরা সাড়ে সাত নদী পার করে মুচকুন্দ বনের মধ্যে ভাঙ্গা মন্দিরের পাশে খ্যাকশেয়ালের বাসায় বন্দী রেখেছে। মাকে রেখে পদ্মমুখী কাটুরকুটুরকে সঙ্গে নিয়ে কিছু খাবার, বাগান থেকে দুমুঠো জাম, দুটি বড় কুমড়া পাতা, দুটি বড় বেগুন, দুটি ছোট বেগুন, চারটি লঙ্কা এবং লেবু নিয়ে রওনা দেয় বাবাকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। সাতটি নদী পারাপারের সময় পদ্মমুখী জলদেবীর আর্শীবাদে চন্দ্রমণির হার, মুক্তোর নোলক, হীরের ফুল, পান্নার চুড়ি, নীলকান্তমণির বাজুবন্ধ, চুনির মেখলা ও সোনার নুপুর পায়। বনের মধ্যে দিশেহারা হয়ে পদ্মমুখী ন্যাকশিয়ালিকে ডাক দিলে প্রতিশ্রুতি মত শিয়ালিনী উপস্থিত হয় পদ্মমুখীকে সাহায্য করতে। শিয়ালিনীর সহায়তায় পদ্মমুখী ভাঙ্গা মন্দিরের খোঁজ পায়। সেখানে মা কালীর আর্শীবাদে ও শিয়ালিনীর সহায়তায় পদ্মমুখী নিজের পিতার সন্ধান পায়। বন্দী পিতাকে সকলের সহায়তায় উদ্ধার করে সগর্বে বাড়ি ফিরে আসে। পরিবারের কষ্ট দূর করে সকলের মুখে হাসি ফোটায় ছোট পদ্মমুখী।

‘ডাইনিবুড়ি বাবা আর পুটুরানি’ গল্পে দেখা যায় পুটুরানি ও তার বাবার সুখের সংসারে একদিন সৎমা এসে উপস্থিত হয়। সৎমা যেমন রাগী তেমনি হিংসুটে। পুটুর বাবার কাছে মেয়েকে নিয়ে সৎমা অহেতুক নালিশ করতে থাকে। সৎমার কথায় বিশ্বাস করে পুটুর বাবাও পুটুকে অহেতুক শাসন করায় মনের দুঃখে পুটু কাঁদতে চলে যায় গোয়ালঘরে। পুটুর হাতে থাকে শুকনো রুটি চোখের জলে ভিজে ভিজে নরম ও নোনতা রুটি খাওয়ার সময় এক ছোট্ট ইঁদুরের হাসি-হাসি, লোভী-লোভী মুখটি দেখে পুটু নিজের পুরো রুটিটাই তাকে খেতে দিয়ে দেয়। খাওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ছোট্ট ইঁদুরটি পুটুকে সাবধান করে –

“লক্ষ্মী মেয়ে পুটুরানি
মনটা তোমার নরম অতি
জানো কি ভাই সৎমা তোমার
ফাঁদ পেতেছে চরম ক্ষতির?
সে যে আপন বোন হয় গা
ডাইনিরানি “বাবা- যাগা”র!
সৎমা তোমায় চায় পাঠাতে
যদি তোমার মাসির বাড়ি
যাবার আগে আমার কাছে
খবর দিয়ে তাড়াতাড়ি।”^২

কিন্তু সাবধান করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সৎমার আদেশ ছুঁচ-সুতো আনতে পুটুকে বনের ভিতর যেতে হয়। পথের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় ইঁদুরের সঙ্গে। ক্ষুধায় কাতর হয়ে দুই জনে সৎমায়ের দেওয়া খাওয়ার খেতে গিয়ে দেখে পুটুলির মধ্যে কেবল নুড়ি-পাথর। নিজের আবেগ ও ক্ষুধাকে সংবরণ করতে না পেরে কেঁদে ফেললে ইঁদুরের আশ্বাসবাণীতে পুটু চোখ খুলে দেখে নুড়ি-পাথরের পরিবর্তে গামছা ভর্তি মন্ডা-মিঠাইতে ভর্তি। ক্ষুধার নিবারণ করে পুটু ইঁদুরের কথা মতো গন্তব্যে যাওয়ার সময় রাস্তায় যা পায় তাই নিজের কাছে রাখে। পথে রুমাল, একশিশি তেল, পাউরুটি, কটি বড় বড় রুইমাছের পেটি, নীলরঙের রিবন দেখতে পেয়ে সেগুলি সঙ্গে করে নেয় ছোট্ট পুটু। অবশেষে ডাইনিবুড়ি বাবা- যাগার সদর দরজার মস্ত লোহার গেটটি খোলার সময় ‘ক্যাঁচোর ক্যাঁচ’ শব্দ হলে রাস্তায় পাওয়া তেলটুকু দিয়ে দরজার কজায় তেল দিতে দরজার আওয়াজ কমে যায়। এইভাবে অভুক্ত কুকুরকে পাউরুটি, ডাইনিবুড়ির ঝিকে সিল্কের রুমাল, বিড়ালকে মাছের টুকরো দিয়ে সাহায্য করে। ডাইনিবুড়ি পুটুর ক্ষতি করতে গরম জ্বলে পোড়তে চাইলে লোহার দরজা, কুকুর, ডাইনি বুড়ির ঝি, বিড়াল

প্রত্যেকে পুঁটুকে পালাতে সাহায্য করে। এমনকি ডাইনিবুড়ির উঠোনের কাটাগাছের ডালে রিবনটা বেঁধে দেওয়ার সেও পুঁটুকে বিদায় জানায়। ডাইনি বুড়ি পুঁটুর সন্ধানে এসে দেখে সে নেই। পুঁটুকে বিড়াল একটি ভিজে গামছা ও জাদু চিরুনি দেয় ডাইনিবুড়ির হাত থেকে বাঁচার জন্য। কার্যক্ষেত্রে ডাইনিবুড়িকে পুঁটুকে ধরতে আসলে ভিজে গামছা নদী হয়ে এবং জাদু চিরুনি ঘন জঙ্গল হয়ে ডাইনিবুড়িকে বাধা দেয়। বুদ্ধি ও মনের জোরে ছোট পুঁটু সমস্ত বিপদ কাটিয়ে নিজের বাবার কাছে ফিরে আসে। সৎমায়ের প্রকৃতি জানার পর পুঁটুর বাবা ও গ্রামের লোকেরা তাকে গ্রাম থেকে বহিস্কার করে। পুঁটু ও তার বাবার জীবনে পুনরায় শান্তি ফিরে আসে।

‘উষসী’ গল্পে দেখা যায় দক্ষিণ দেশের রাজার বারোজন পুত্রসন্তান ছিল, কিন্তু ঘরভর্তি বীরপুরুষে রানিমার মন ভরে না। কন্যাসন্তানের বাসনায় এক দিন ভোরের প্রকৃতি দেখে রানিমা বলে বসেন – যদি তাঁর একটি গোলাপ রঙের মেয়ে হত যার নাম সূর্যের মত ঠোঁট, আর কালো পাখিদের মতন চোখ, গলার সুর হত সুমধুর তাহলে তিনি নিজের বারোটি ছেলেকেই দিয়ে দিতেন। সেই সময়েই ওখান দিয়ে পরি রানি যাচ্ছিলেন। রানিমার কথা শুনে রেগে তিনি রেগে বলে ওঠেন-

“এত সুন্দর এক ডজন রাজপুত্রের কোল ভর্তি, তাতেও রানির মন ওঠে না? ঠিক যেটি নেই সেইটিই চাই, যা আছে তাতে খুশি নয়। ...যা চেয়েছে তাই পাবে।”^৩

সেই মত পরিরানি ছদ্মবেশে রানিমাকে জানিয়ে দিয়ে যায়, সে যেমন কন্যা সন্তান চেয়েছে তেমনই পাবে কিন্তু রানিমার পুত্রেরা আর তার কাছে থাকবে না। আঁতুড়ঘরে যাবার আগে রানিমা তাঁর বারোজন পুত্র সন্তানকে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে চারিদিক বন্ধ করে সেপাই দ্বারা সুরক্ষিত করেন। কিন্তু রাজকন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেপাইরা ঘুমিয়ে পড়ে, আর রাজবাড়ির একটি ঘুলঘুলি থেকে এক সারি বুনো হাঁসকে উড়ে যেতে দেখা যায় এবং রানিমার ঘর শূন্য থেকে যায়। রাজকুমারী উষসী লক্ষ্মীমন্ত, মিষ্ট স্বভাবের। রাজকন্যা একটু বড় হয়ে ভাইদের হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনে রাজপ্রসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ে ভাইদের সন্ধানে। ঘন বনের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে এক কুটিরে প্রবেশ করে উষসী বারোটি বিছানা, বারোটি গামছা, ও বারো জোড়া নাগরা জুতা দেখতে পায়। উষসী ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে ঘরে রাখা খাবার খাওয়া শেষ হতে দরজা খুলে ঘরে প্রবেশ করে বারোজন রাজপুত্র। রাজপুত্রদের কাছে তাদের পরিণতির বিবরণ শুনে উষসী বুঝতে পারে বারোজন রাজপুত্রই তার হারিয়ে যাওয়া ভাই। পরি রানির কাছ থেকে উষসী জানতে পারে-জলা জংলায় পাটবন থেকে আঁশ বের করে সুতো কেটে বারোটি গেঞ্জি বুনতে হবে। বুননের সময় উষসীর কথা, হাসি, কান্না কিছু করা যাবে না। পাঁচ বছরে গেঞ্জি বুননের কাজ শেষ হলে সেগুলি পরিধান করলেই ভাইদের উপর অভিষাপ দূর হবে। ব্রত অনুযায়ী উষসী গেঞ্জি বুননের কাজের মধ্যেই দূর দেশের রাজকুমার তাকে বিবাহ করে নিজ রাজ্যে নিয়ে যায়। কিন্তু রাজকুমারের সৎমায়ের ষড়যন্ত্রে উষসীর সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে এক নেকড়ে মুখে ছুড়ে দেওয়া হয়। এবং রানিমার আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত বের করে ঘুমন্ত উষসীর ঠোঁটে-মুখে মাখিয়ে তাকে রাক্ষসী বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করে। রাজামশাই সৎমায়ের কথায় বিশ্বাস করে উষসীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে প্রস্তুত হয়। উষসী মনের কষ্ট সংযম করে একমনে অস্তিম গেঞ্জিটির বুননের কাজ শেষ করে। বুননের কাজ শেষ করে উষসী দৃঢ়চিত্তে বলে –

“এমন নিষ্ঠুর অভিযোগকে উত্তর দেবার যোগ্য কথা বলে আমি মনে করি না।”^৪

এমন সময়েও বারোটি বুনো হাঁস উড়ে এসে উষসীকে ঘিরে ধরে দাঁড়াতেই উষসী ঝুড়ি থেকে বারোটি গেঞ্জি হাঁসদের গায়ে ছুঁড়ে দেওয়ার সঙ্গেই তারা রাজপুত্র হয়ে যায়। রাজপুত্রদের কাছ থেকে সবাই উষসীর ব্রত পালন সম্পর্কে জানা যায়। সভার মধ্যে নেকড়ে বাঘ দেখে সৎমা ভয় পেলেও সবাই দেখে নেকড়ে বাঘের মুখে একটি দোলনায় শুয়ে খেলছে উষসীর কন্যা। নেকড়েটি উষসীর মেয়েকে রেখে সৎমায়ের ঘাড়টি কামড়ে রাজপ্রসাদ থেকে নিয়ে গিয়ে মরুভূমির প্রান্তে ছেড়ে দিয়ে আসেন তার চারিত্রিক পরিবর্তনের জন্য। নেকড়ে বাঘটি ছিল পরিরানি। উষসীর সন্তানকে বাঁচাতে তিনি নেকড়ের ছদ্মবেশ ধরেন। উষসীর সংযমের সঙ্গে ব্রত পালনের মাধ্যমে নিজের ভাই ও সন্তানকে ফিরে পায়।

‘নীলমণিয়া’ গল্পে সাহসী সর্পকুমারী শঙ্খিনী পাথরটি হারিয়ে কান্নায় আকুল, তখন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নেউলকুমার। নেউলকুমার নীলমণি খুঁজে দেওয়ার পুরস্কার স্বরূপ ছদ্মবেশী সর্পকুমারীকে বিবাহ করে। কিন্তু তাও সর্পকুমারীর ভয় কাটে না। সর্পকুমারী প্রতি পূর্ণিমার রাত্রিতে চমৎকার পায়ের রাঙ্গা করে তাতে ঘুমপাড়ানি ফুলের মধু

মিশিয়ে দেয়। নেউলকুমার সেই পায়ের খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, সর্পকুমারী নিজ রূপ ধারণ করে সর্পরাজ্যে চলে যায়। ভোর হতেই সর্পকুমারী রাজকন্যার রূপ ধরে নেউলকুমারে পাশে ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু এই লুকোচুরির খেলা ধরা পড়ে একদিন। নিজের অবস্থানে অবিচল থেকে শঞ্জিনী জানায় –

“নিজের থেকে আমি তো তোমাকে বিয়ে করতে চাইনি, তুমিই জোর করে আমাকে বিয়ে করেছ, আমি তখন যদি তোমাকে বলতুম যে আমি শঞ্জিনী সর্পকন্যা, তুমি তাহলে আমার নীলমণিও খুঁজে দিতে না, আমাকে মেরেও ফেলতে। ...আপন প্রাণ রক্ষার অধিকার সব জীবেরই আছে। তাই আমি মিথ্যা বলেছিলাম। ...পরোপকার যদি শর্ত বেঁধে করা হয় তবে পরোপকারের পুণ্যটা হয় না। আর দ্বিতীয় কথা, তুমি যে আমাকে বিয়ে করার জন্য আমারই নীলমণির কল্যাণে মানুষ হয়েছিলে, তাতে যদি দোষ না হয় তবে আমারও রাজ কন্যে সাজায় দোষ নেই, আমি তো সত্যিই রাজকন্যে। সর্পরাজ্যের কন্যে।”^৫

এই ভাবে রূপকথার নারীরা যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনায় পরিচয় দেয়। শঞ্জিনীর যুক্তি বুঝে নেউলকুমার নিজের ভুল বুঝতে পারে। উভয়ে সমুদ্রের জলে নীলমণিও পাথরটি বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ মানুষের জীবন পায় শঞ্জিনী ও নেউলকুমার। উভয়ের মানব সন্তান হয়ে জন্মায় ‘নীলমণিয়া’। নীলমণিয়া কোনদিন নিজের বাবা- মায়ের অতীত জানতে পারে না। শঞ্জিনী স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাতে থাকে।

‘টুলটুল, ফুলফুল আর বুলবুল’ হল মায়ের স্নেহের এক মায়াময় গল্প। বাঘিনী মা ও মানুষ মায়ের সন্তানকে একসঙ্গে মাতৃস্নেহ দানের ভয়ানক সুন্দর গল্প। টুলটুল ও ফুলফুলের বাবা-মা ডাইনির অভিশাপে কুকুর ও বিড়াল হয়ে যাওয়ায় এক বাঘিনী মাসি প্রতিদিন তাদের চারজনকে বাঘের দুধ খাইয়ে যায়। সেই দুধ খেয়েই ওরা বেঁচে থাকে। ডাইনি বুড়ি ছলনা করে দুই ভাই-বোনকে মারতে চাইলে টুলটুল ও ফুলফুলের পোষ্যরূপী বাবা-মা ডাইনিকে শেষ করে। ডাইনির অভিশাপ নির্মূল হলে টুলটুল ও ফুলফুল নিজের বাবা-মাকে ফিরে পায়। এমনকি বাঘিনী মাসি যখন বলে –

“আমার দুধের বাছারা, দেখি তো আমাকে চিনতে পারো কিনা! বলে একটি রুপোর থালায় সোনার বাটিতে ভর্তি চার বাটি সুগন্ধী ক্ষীর আর স্ফটিকের গেলাসে চার গেলাস গোলাপি শরবৎ নিয়ে এগিয়ে এলেন যিনি, তাঁর চোখের মিষ্টি হাসিটা ঠিক বাঘিনী মাসির মমতা মাখা চোখের মতন।”^৬

তখন ফুলফুল ও বুলবুল চিনতে পারে তাদের বাঘিনী মাসিকে। ডাইনিবুড়ির অভিশাপে টুলটুল ও ফুলফুলের ধাইমাও বাঘিনী হয়ে গেলেও তিনি ছিলেন তাদের ধাই মা। মায়ের চিরন্তন মর্তসত্তা, প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে আগলে রাখার মানবিক গুণাবলী যেন আমাদের মায়ের চিরপরিচিত রূপকেই তুলে ধরে। ‘চুমকির মা পদ্মমনি’ গল্পেও মা ও কন্যার চিরায়ত স্নেহ-ভালোবাসার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। চুমকি যখন খুব ছোট তখন একদিন মেয়ের মনোবাসনা পূরণ করতে পদ্মমনি পদ্ম পুকুরে ফুল তুলতে গিয়ে যক্ষিবুড়োর প্রাসাদে বন্দি হয়। কিন্তু পদ্মমনি ভিত্তি নয়। পুকুরে মাছ-ঝিনুক-শামুক সবার সহায়তায় পদ্মমনি যক্ষিবুড়োকে হত্যা করে। সন্তানকে পেয়ে মা জানায় –

“আমাকে যক্ষিবুড়ো ধরে নিয়ে গিয়েছিল যক্ষপুরীতে। মানুষের সাত বছরে যক্ষের একদিন। সে আমাকে এতদিন চক্ষের আড়াল করত না। এতক্ষণে তাদের দিন ফুরিয়ে রাত হয়েছে। জন্মের শোধ সে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও অমনি পালিয়ে এলুম তোমার কাছে।”^৭

মাতৃহের শক্তির কাছে জগতের সমস্ত অশুভ শক্তির পরাজয়ের কথাই যেন কাহিনীতে ফুটে উঠেছে।

‘এক চাষীর তিন মেয়ে’ গল্পে তিন কন্যা হল শশীকলা, শরৎশশী ও কিরণশশী। তারা বুদ্ধিমতী, কর্মঠ ও বুঝদার। বাবার সঙ্গে মাঠে ও মায়ের সঙ্গে ঘরে কাজ করে। তিনজনেই গ্রামের পাঠশালাতে পড়া সম্পন্ন করেছে। রূপে-গুণে-স্বভাবে শিক্ষায় মেয়েদের বিবাহের উপযোগী পাত্র পাশ্চবর্তী গ্রামে পাওয়া যায় না। শেষপর্যন্ত ঝড়ের দেবতার সঙ্গে শশীকলার, ভূমিকম্পের দেবতার সঙ্গে শরৎশশীর এবং বন্যার দেবতার সঙ্গে কিরণশশীর বিবাহ হয়। বহুদিন মেয়েদের দেখতে না পেয়ে চাষী ও তার স্ত্রী তীর্থে যাত্রাকালীন বিপদে পড়লে কন্যাদের সাহায্যে জামাইয়েরা বিপদ থেকে তাদের উদ্ধার করে। মেয়ে, জামাই, নাতি নাতনীদের সাহচর্যে ভরে ওঠে চাষির ও তার অর্ধাঙ্গিনীর জীবন।

‘চন্দন রাজার বউ’ গল্পে দেখা যায়, চন্দনরাজা সারাদিন মৃত্যু কোলে ঢোলে থাকেন, শুধু মধ্যরাত্রে বেঁচে ওঠেন। কয়েক ঘন্টা পর আবার মৃত মানুষে পরিণত হয়। চন্দনরাজাকে এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে মুক্ত করেন রাজকন্যা চন্দনী। ‘পদ্ম কদম’-এ রাজপুত্র কদমকুমারকে পল্লবী রাজার কারাগার থেকে জেলেবাড়ির মেয়ে পদ্মকুঁড়ি উদ্ধার করে। ‘সুঘনি-কলমি’ গল্পে রয়েছে গরিব দুই বোন যারা নিজেদের পোষ্য ছাগলের দুধ খাইয়ে রাজার দুরারোগ্য ব্যাধী সারিয়ে দেন। দুই রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হয় দুই বোনের। ‘বোকা রাজার বুদ্ধিমতী রানি’ গল্পে দেখা যায়, রাজা যতবারই যুদ্ধ করতে বেরোন, রানি ততবারই স্বপ্নের গল্প বলে রাজাকে যুদ্ধ করতে বিরত করেন। রাজকর্মচারীরা বিপদে পড়লে তাদের পরামর্শ দিয়ে রক্ষা করেন পাশের রাজ্যের রাজকন্যা। রানির উদ্যোগে সেই রাজকন্যা রাজার বৌমা হন। বিয়ের পর একদিন রাজকন্যা তাঁর শ্বশুরকে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নেন, তিনি কখনও আর যুদ্ধযাত্রা করবেন না। এইভাবে নবনীতা দেবসেন তাঁর রূপকথার গল্পগুলিতে নারীশক্তির কথা তুলে ধরেছেন।

‘নীলাম্বরী পরা কচ্ছপ’ গল্পে মাতৃসত্ত্বার এক প্রকাশ দেখা যায়। রাজার তিন রানির মধ্যে একজন হিংসুটে, একজন নিপাট ভালোমানুষ ও একজন সাধারণ স্বভাবের। হিংসুটি ও সাধারণীর পুত্রসন্তান ছিল আর ভালোরানির ছিল কন্যাসন্তান। পরশ্রীকাতর হিংসুটে রানি ভালোরানির ক্ষতি সাধনের জন্য নীল রঙের কচ্ছপ বানিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেয়। রাজ বাড়ির সবার মনখারাপ হয়ে যায়। ভালোরানির মেয়ে মনকণ্ঠে নদীর ধারে খেলা করতে গেলে নীলাম্বরী কচ্ছরূপী মায়ের কণ্ঠস্বর শুনে মাকে চিনতে পারে, অভূক্ত সন্তানকে মাতৃস্নেহে খাবার খাওয়ায়। হিংসুটে রানি ছলনা করে নীলাম্বরী কচ্ছপকে খেতে চাইলে কচ্ছপটি মারা গেলেও তার মাতৃসত্ত্বা মারা যায় না। তাই মেয়ের ভাগের মাংসটি বাগানে পুকুরের পাশে পুঁতে দেওয়ায় বেলগাছ জন্মায়। বেল ফল স্থান পায় রাজকন্যার ঘরে। রোজ রাতে ভিতর থেকে রানি বেরিয়ে মেয়ের সঙ্গে গল্প করে। রাজা সমস্ত কিছু জানতে পেরে হিংসুটে রানিকে শাস্তি দিতে চাইলেও ভালো রানির কারনে তা হয় না। মাতৃহৃদয়ের চিরকালীন স্নেহ-ভালবাসার কথাই কাহিনীতে ব্যক্ত। তাইতো এক মা অপর মাকে শাস্তি না দিয়ে চরিত্র সংশোধনের পাঠ দেয়।

‘রাজকুমার বৃষস্কন্ধ আর শ্রীময়ী’ গল্পে রাজকুমার বৃষস্কন্ধ যেমন অহংকারী, বদমেজাজী, জেদি ও হিংস্র। বৃষস্কন্ধকে শাস্ত করতে বিবাহ দিতে চাইলেও তার স্বভাবের কারণে বিবাহ হয় না। মালীর মেয়ে শ্রীময়ীর যেমন নাম, তেমনি রূপ ও মেয়েটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। সে নির্দিধায় বৃষস্কন্ধকে বিবাহ করে বুদ্ধির জোরে রাজকুমারের অহংকারকে দমন করে তাকে ভালোমনের রাজকুমারে পরিণত করে। ‘মরিচকলি’ গল্পে বুলবুল পাখির জাদুকরী কাঁচালক্ষা খেয়ে জিনের বাগানে ডিম দিয়ে চলে যায়। সেই ডিম দিয়ে জন্মায় ছোট্ট মেয়ে মরিচকলি। জিন মানুষখেকো হলেও, বাচ্চাদের ভালোবাসত। মরিচকলিকে সে সন্তানস্নেহে বড় করে। মরিচকলির বুদ্ধিতে জিনের সহায়তায় মরিচকলির রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ হয়। কিন্তু কন্যার বিরহে জিন ঘুমাতে পারে না। কিন্তু মরিচকলি ভালো আছে দেখে বারো বছরের জন্য জিন ঘুমিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে মরিচকলির সন্তান জন্মালে রাজবাড়ির কিছু হিংসুটে বুড়িরা ছলনা করে তার সন্তানকে হত্যা করে ও মরিচকলিকে রাফসী বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। শাস্তি স্বরূপ মরিচকলি মৃত্যুদণ্ড লাভ করলেও মাতৃসত্ত্বার মরন হয় না। মরিচকলির প্রাণ একজোড়া বুলবুল পাখি হয়ে বাগানে বাসা বেঁধে থাকে। বুলবুল পাখিদের সারাদিন মরিচকলির দুঃখের কাহিনী গায়, ছোট্ট রাজপুত্রের শোকে কাঁদে ও রাজাকে ডাকতে থাকে। একদিন রাজা সব শুনে নিজ ভুল বুঝতে পেরে অভিষাপ মোচন করতেই মরিচকলি ও তার সন্তান সশরীরে ফিরে আসে। মাতৃশক্তির চেনা সুরই যেন কাহিনীতে ধ্বনিত হয়।

‘চাষির বউ চম্পাকলি’ গল্পে দেখা যায় এক নিষ্ঠুর জমিদারের অত্যাচারে বন্দী হয় চম্পাকলি। কেননা চম্পাকলি আপন মনে হাসলেই গা থেকে চাপা ফুলের সুন্দর সুবাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত। জমিদার চাক্ষুস তা দেখার জন্য চম্পাকলিকে বন্দী করে। কিন্তু মনের দুঃখে চম্পাকলির মুখে হাসি ফোটে না। রাত্রিতে বন্দীদশায় জানলার বাইরে চোরদের কথায় সে জানতে পারে জমিদার বাড়িতে চুরি হয়েছে। এক বোকা ধোপা চোরদের কাছেই নিজের গাধার সন্ধান চাইছে দেখে কষ্টের মধ্যে হেসে ফেলে। আর হাসার সঙ্গে সঙ্গেই চম্পাকলির গায়ের সুবাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে জমিদার ও জমিদারগিল্লীর ঘুম ভেঙে যায়। তারা চম্পাকলির কাছে রাত্রি বেলায় হাসির কারণ জানতে চাইলে চোর ও বোকা ধোপার কথা জানতে পারে। চম্পাকলির সহায়তায় জমিদার নিজেদের হারানো ধন ফিরে পাওয়ায় চম্পাকলিকে পুরস্কার দিয়ে বাড়িতে পাঠানোর

ব্যবস্থা করে। এমনকি চম্পাকলির মনখোলা হাসি থেকে চাপা ফুলের সুগন্ধে যেন কোন জাদু কাজ করে। মন্দ জমিদার ভালো হয়ে যায়। সে আর অত্যাচারী থাকে না। বরং গরীব চাষিদের জমি বিলি করে দিয়ে তাদের দৈন্যতা দূর করে জীবনে নতুন ভাবে পথ চলা শুরু করে।

‘চাষি বউয়ের মেয়ে’ গল্পে এক চাষি দম্পতি, তার তিন পুত্র ও পাখির বরে প্রাপ্ত কন্যার স্নেহের কাহিনী ফুটে উঠেছে। চাষি বউ পুত্রদের পাশাপাশি কন্যাসন্তানকে ঘর ও বাইরের কাজ শেখাতে চায়। চাষি মেয়ে হাসি মুখে ঘর ও বাইরের কাজ শেখে। চাষি বউ নিজের পুত্রদেরও বাইরের কাজের পাশাপাশি ঘরের কাজ শেখাতে চাইলেও ব্যর্থ হয়। সমাজে নারী-পুরুষের জীবনের ছবি যেন ফুটে ওঠে। ঘটনাচক্রে বনের এক লোভী অজগরের খাদ্য হিসাবে চাষি ও তিন পুত্রকে খেয়ে ফেলেলেও পাখির সাহায্যে চাষি কন্যা অজগরকে মেরে নিজের পিতা ও ভাইদের উদ্ধার করে। এমনকি অজগরের পেটের মধ্যে প্রাপ্ত ধনসম্পদ পেয়ে মনের আনন্দে চাষি কন্যা সেই সম্পদ ও বাবা-ভাইদের নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

পরিশেষে বলা যায় ছোটদের জন্য নবনীতা দেবসেন খুব বেশি লেখেননি। কিন্তু যতটুকু লিখেছিলেন তা একেবারেই ছোটদের জন্য। তিনি পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই ছোটদের জগতকে সাহিত্যে তুলে ধরেছিলেন। পরিবর্তনশীল সময়ে শিশুর মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করে তিনি রূপকথার জগতকে ভিন্ন আঙ্গিকে ছোটদের উপযোগী করে ভাষা ও কল্পনার মিলন ঘটিয়েছেন। ছোটদের জন্য লেখা বলেই হাসির আড়ালের তীক্ষ্ণতাগুলকে ভেঁতা করে দিতে চাননি। ছোটদের জন্য লেখায় অযাচিত ছেলেমানুষি করেননি। সমকালীন রূপকথা তুলে ধরতে চেয়েছেন সাহিত্যে। যেখানে নারীরা দুর্বল, অসহায়, শক্তিহীন নয়। বরং নারী চরিত্রের দৃঢ়তার প্রকাশ দেখি তাঁর রূপকথার গল্পগুলিতে। কন্যা-জায়া-মাতৃসত্তার দৃঢ় প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর রূপকথায়। নারীর মনকে পরিমিত আবেগ, যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনা দিয়ে পরিমাপের ক্ষমতা তাঁর অনন্য। নারীর মনন-চিন্তা-চেতনা তাঁর রূপকথায় বারবার আসলেও সেখানে কোন পক্ষপতিত্ব নেই। নারীবাদী সত্তা নিয়েও নিজেকে নারীবাদী দাবি করেননি কখনও বরং একান্তভাবে নারীর ভাষ্যকার হয়ে উঠেছেন।

রূপকথাকে নবনীতা দেবসেন যেন ঘরের কাহিনী হিসাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রূপকথার মাধ্যমে তিনি শিশুমনের অশৈশব জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। রূপকথার মোড়কে যেন মানুষের জীবনের কথাই যেন ধ্বনিত হয়। নারী জীবনের যুদ্ধ-যন্ত্রনা, সাদা-কালো, ঈর্ষা-দ্বেষ্টের ছবি যেমন প্রকাশিত, তেমনি নারী মনের দয়া-মায়া, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-বেদনা, জটিলতা, কটোরতা, সমস্তই যেন রূপকথার মোড়কে উপস্থিত হয়েছে। কেবল দুঃখ-যন্ত্রনা, জটিলতা নয়, তা থেকে উত্তরণের পথও দেখিয়েছেন নারীও সত্তার মাধ্যমে। সং মানুষের জীবনের সংঘর্ষ, সত্যের জয়ের কাহিনীই ফুটে উঠেছে। আধুনিকতার মোড়কে নবনীতা দেবসেন নারী সত্তাকে ভিন্ন রূপে পরিবেশন করেছেন।

Reference:

১. দেবসেন, নবনীতা, রূপকথা সমগ্র, পত্রভারতী কলেজ স্ট্রিট, কলেজ রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, ভূমিকাংশ।
২. দেবসেন, নবনীতা, ইচ্ছামতী, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ৪৩-৪৪
৩. ঐ, পৃ. ১৮৫
৪. ঐ, পৃ. ১৯৩
৫. ঐ, পৃ. ৭৮
৬. ঐ, পৃ. ৮৬
৭. ঐ, পৃ. ১০০